بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৮ই জুলাই, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এখন আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কিছু কথা উপস্থাপন করব। প্রতিটি রেফারেন্স বা উদ্বৃতি পৃথক পৃথক হবে আর প্রতিটি নিজের মাঝে এক শিক্ষনীয় দিক রাখে। কিছু কথা তিনি (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বরাতেও বর্ণনা করেছেন।প্রথম কথা হলো তবলীগের প্রেক্ষাপটে। এতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দেশ বিভাগের পর কাদিয়ানের জামাতকে তাদের জলসা সালানায় মনোযোগ আকর্ষণ করে বার্তা প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন, আপনাদের কাজ হলো তবলীগ করা, আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে আগাধ পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। এতে সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে ইলহামে জানিয়েছিলেন, আমি তোমার প্রচার পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব। আর একই সাথে এটিও বলেছেন যে, যতদিন পৃথিবী বর্তমান থাকবে ততদিন খোদা তা'লা তোমার নামকে সম্মানের সাথে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন আর তোমার তবলীগ এবং তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছিয়ে দিবেন। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তবলীগ, তার প্রচার ও কাজ এবং তার নামকে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে, আর খোদা নিজ প্রতিশ্রুতি অনুসারে এই কাজ করে চলেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন, ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু একই সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তবলীগের প্রতি জামাতের সদস্যদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, আমার বই পুস্তক থেকে জ্ঞান অর্জন কর এবং তবলীগ কর, যেভাবে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা তবলীগ করতেন। যাহোক খোদার প্রতিশ্রুতি থেকে সর্বাত্মকভাবে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে, কিন্তু খোদা তা'লা এসবকে বাস্তবায়নের জন্য যারা নবীর সাথে বয়আতের অঙ্গীকার করে তাদের ওপরও দায়িত্ব ন্যাস্ত করেন যে, তারা যেন উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এতে অংশ নেয় যাতে তারাও খোদার কৃপাভাজন হতে পারে। এমন হলে খোদা নিজের প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাদের কাজে প্রভূত বরকত বা কল্যাণ রেখে দেন, তাদেরকে কল্যাণমন্ডিত করেন এবং নিত্য নতুন মাধ্যম ও উপকরণ সৃষ্টি করেন। আমাদের অভিজ্ঞতা আছে যে, আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে তবলীগের বহু মাধ্যম সৃষ্টি করেছেন।

যাহোক এখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর পয়গাম বা বার্তার সেই অংশ উপস্থাপন করছি যা তবলীগ সংক্রান্ত। কাদিয়ানে আহমদীদের সংখ্যার স্বল্পতা এবং উপায় উপকরণের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং দরবেশদের মনোবল চাঙ্গা করেন। তিনি এতে তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রাথমিক যুগের অবস্থার বরাতে কথা বলেছেন। তিনি তাদের সম্বোধন করে

বলেন, এতে সন্দেহ নেই যে, কাদিয়ানে আপনাদের সংখ্যা মাত্র তিনশত তের, কিন্তু আপনারা হয়তো এই কথাকে ভুলে যান নি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন খোদার নির্দেশে কাদিয়ানে কাজ আরম্ভ করেছিলেন তখন কাদিয়ানে আহমদীদের সংখ্যা কেবল দুই বা তিন ছিল। তিন শত অবশ্যই তিন এর চেয়ে সংখ্যায় বেশি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির সময় কাদিয়ানের জনবসতি ছিল এগার শত। এগার শত এবং তিনের অনুপাত হলো এক অনুপাত তিনশত ছেষট্টি, অর্থাৎ যদি এখন, অর্থাৎ যখন তিনি (রা.) এই বার্তা প্রেরণ করেন সেই সময়, তিনি বলেন যে, এখন কাদিয়ানের জনবসতি যদি বারো হাজার ধরে নেয়া হয় তাহলে বর্তমান আহমদী জনবসতির সাথে কাদিয়ানের বাকি জনবসতির অনুপাত হবে এক অনুপাত ছয়ত্রিশ যা পূর্বে ছিল এক অনুপাত তিনশত ছেষট্টি। এক কথায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন কাজ আরম্ভ করেছেন তার চেয়ে আপনাদের শক্তি, এখানে কাদিয়ান বাসীদের তিনি (রা.) বলেন যে, সেই সময়ের তুলনায় এখন আপনাদের শক্তি দশগুণ বেশি। এছাড়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন কাজ আরম্ভ করেন তখন কাদিয়ানের বাইরে কোন আহমদীয়া জামাত ছিল না। কিন্তু এখন ভারতের বহু স্থানে আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সেসব জামাতকে জাগ্রত ও সুশৃঙ্খল করা, এবং এক নতুন সংকল্পের সাথে তাদেরকে দন্ডায়মান করা আর এই সংকল্প নিয়ে তাদের শক্তিকে পুঞ্জিভূত করা যে, তারা ইসলাম এবং আহমদীয়াতের প্রচারকে ভারতের চার দিগন্তে ছড়িয়ে দিবে, এটি আপনাদেরই কাজ। আজও হয়তো এই অনুপাতই হবে, এখন আহমদীরা সেখানে হাজার হাজার হলেও অন্যদের সংখ্যাও একই অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়ে থাকবে। আর এখন তো আল্লাহ্ তা'লা পূর্বের তুলনায় অনেক উত্তম উপকরণ সৃষ্টি করেছেন আর মাধ্যমও খোদার কৃপায় অনেক বেশি। আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় ভারতে এখন বিভিন্ন মাধ্যমে জামাতের পরিচিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু যারা কর্মী, যারা ওয়াকফে জিন্দেগী এবং মুবাল্লিগ ও মুরব্বী তাদেরও ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের চেষ্টা প্রচেষ্টাকে বেগবান করতে হবে। তারা মারও খায়, বিরোধিতাও হয়, কিন্তু তাসত্ত্বেও প্রজ্ঞার সাথে তবলীগের কাজকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেরও আমার এই কথা নিজেদের সামনে রাখা উচিত যে, খোদা তা'লা আমাদেরকে তবলীগের কাজ করার এবং এটিকে ব্যাপকতর করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর এটি কুরআনের নির্দেশ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এই কথাই বলেছেন। মহানবী (সা.)-কেই আল্লাহ্ তা'লা এই নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এর জন্য আমাদের সুসংহত, সুসংগঠিত এবং সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে যেন এই কাজকে ব্যাপকতর করা যায়। আর তবলীগের পাশাপাশি নবাগতদের বা যারা বয়আত করে জামাতভুক্ত হয় তাদেরকে স্থায়ীভাবে জামাতের অঙ্গীভূত করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। অনেক জায়গায় তবলীগও হয় আর মানুষ জামাতভুক্তও হয় কিন্তু এরপর তাদেরকে স্থায়ীভাবে জামাতের অঙ্গীভূত করা হয় না। এর ফলে যারা আসে তাদের অনেকেই চলে যায়। ভারতে বেশির ভাগ গ্রাম্য এবং দরিদ্র মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করে, কিন্তু বিরোধীদের পক্ষ থেকে যখন হৈ-হুল্লোড় আরম্ভ হয় তখন কিছু দুর্বল ঈমানের মানুষ ভয়ে ভীত হয়ে ঈমান নষ্ট করে। আমাদের ব্যবস্থাপক বা কর্মী বা যারা পরিকল্পনাকারী, তবলীগের কাজে তারা যেভাবে পরিকল্পনা হাতে নেয় এর ফলে আল্লাহ্ তা'লার

ফযলে সেখানে ভালো কাজও হচ্ছে। নাযারাত ইসলাহ্ ইরশাদের পাশাপাশি আরো কিছু বিভাগ তবলীগের ময়দানে কাজ করছে। সেখানে নুরুল ইসলাম নামে একটি বিভাগ আছে, আর তাদের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। ফোনের মাধ্যমে এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেও তারা তবলীগের কাজ করছে। একইভাবে ওয়াকফে জাদীদের ব্যবস্থাপনার অধীনেও তবলীগের কাজ হচ্ছে। এমনসব স্থান যেখানে বিরোধীরা গিয়ে নতুন বয়আতকারীদের বা নতুন আহমদীদের কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করে তাদের সেখানে গিয়ে নতুন বয়আতকারীদের মনোবল দৃঢ় করা উচিত। জেলার কর্মকর্তা এবং কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের তাৎক্ষনিকভাবে সেখানে পৌঁছা উচিত যেখান থেকেই সংবাদ আসে যে, সেখানে কোন আহমদীর কোন প্রকার কষ্ট হয়েছে, তা ছোট কোন গ্রামই হোক না কেন। একইভাবে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেও সেখানকার লোকদের এবং মুবাল্লিগদের পরবর্তী যোগযোগের মানকে উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত এবং স্থানীয় লোকদের অবস্থা সম্পর্কে স্থায়ীভাবে অবগত থাকার জন্য উত্তম পরিকল্পনা হাতে নেয়া উচিত কেননা সেখানেও, যেভাবে আমি বলেছি, গতকাল দরসেও বলেছি যে, জামাতের বিরোধীরা তাদেরকে আহমদীয়াতের প্রতি বিতশ্রদ্ধ করার ষড়যন্ত্র নিয়ে তাৎক্ষনিকভাবে পৌঁছে যায়। যাহোক যেখানে বেশি বয়আত হয় এমন দারিদ্র কবলিত দেশে এবং এমনসব স্থানে এই ধরণের কাজ হাতে নেয়া উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যা খাজা কামালুদ্দিন সাহেবের সাথে সম্পর্ক রাখে, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় খিলাফতের নির্বাচনের সময় ফিতনার পরীক্ষা কবলিত হন আর লাহোরীদের নেত্রীস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার নেত্রীত্বের প্রয়োজন ছিল যা তিনি সেখানে লাভ করেছেন। তার সম্পর্কে অর্থাৎ তিনি তার জ্ঞান কিভাবে বৃদ্ধি করেছেন সে বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, খাজা সাহেবের উন্নত বক্তৃতা এবং লেকচারের পেছনে রহস্য কি ছিল? তিনি (রা.) বলেন, খাজা কামালুদ্দিন সাহেবের সাফল্যের বড় কারণ ছিল তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী পাঠ করে একটি ভালো বক্তৃতা প্রস্তুত করতেন। এরপর কাদিয়ান এসে কিছুটা খলীফা আউয়াল (রা.)-কে জিজ্ঞেস করতেন, আর কিছুটা অন্যান্য আলেমদের জিজ্ঞেস করতেন আর এভাবে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য লেকচার বা বক্তৃতা প্রস্তুত করতেন। এরপর সেই বক্তৃতা নিয়ে ভারতের বিভিন্ন শহর সফর করতেন এবং খুব সাফল্য পেতেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, খাজা সাহেব বলতেন যে, যদি এক ব্যক্তির কাছে বারোটি বক্তৃতা প্রস্তুত থাকে তাহলে তার অসাধারণ খ্যাতি অর্জন হতে পারে। তিনি বলেন, খাজা সাহেব সাতটি লেকচারই প্রস্তুত করেছিলেন। এরপর তিনি বিলাত বা ইংল্যান্ড-এ চলে যান। কিন্তু সেই সাতটি বক্তৃতার মাধ্যমেই তিনি অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি মনে করি যে, একটি বক্তৃতাও যদি ভালোভাবে প্রস্তুত করা হয় তাহলে তা যেহেতু ভালোভাবে মুখস্থ থাকে তাই মানুষের ওপর এর ভালো প্রভাব পড়তে পারে।

অতএব প্রথম হলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী, যা থেকে লেকচার প্রস্তুত করা যায়। এগুলো পড়া আবশ্যক। এরপর সেগুলো একটু বুঝা বা অনুধাবন করা এবং বক্তৃতার প্রস্তুতি নেয়া। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর কিছুটা বিশদ আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, প্রথম যুগে সরফ এর পৃথক শিক্ষক ছিল, নাহাবের পৃথক, কাঁচা রুটির পৃথক শিক্ষক আর পাকা রুটির পৃথক। এখন সেই যুগ আবার এসেছে যখন বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে। এখন স্পেশালাইযেশন তথা বিশেষজ্ঞ হওয়ার যুগের সূচনা হয়েছে। তিনি বলেন, এমনই হওয়া উচিত, বক্তা বা লেকচারারদের ভালোভাবে বিষয় প্রস্তুত করে দেয়া উচিত যেন তারা বাইরে গিয়ে সেই বক্তৃতাই করে। এর ফলে জামাতের উদ্দেশ্য অনুসারে বক্তৃতা হবে, আর আমরা এখানে বসেই বুঝতে পারবো যে, এরা কি বক্তৃতা করবে। এটিই আসল বক্তৃতা হবে। এছাড়া স্থানীয় কোন প্রয়োজন যদি দেখা দেয় তাহলে সমর্থন সূচক বক্তৃতা হিসেবে অন্য কোন বিষয়েও তারা কথা বলতে পারে।

তো এই হলো মুবাল্লিগ এবং তবলীগকারীদের জন্য নির্দেশিকা বা নীতি আর তাদের জন্যও যাদের জ্ঞানের আসরে আনাগোনা রয়েছে। বক্তৃতা যদি এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় তাহলে বড় বড় প্রফেসর এবং কিছু নামধারী ধর্মীয় আলেম এবং এমন মানুষ যারা ধর্মের ওপর আপত্তি করে তারাও প্রভাবিত হয়। সম্প্রতি তবলীগ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় এখানে একটি অনুষ্ঠান হয়েছে যাতে ইসরাইল থেকেও এক বড় ইহুদী এসে অংশ গ্রহণ করে। তিনি বেশ কিছু পুস্তকাবলীর লেখকও। আমাদের এক যুবক মুরব্বী ভালো প্রস্তুতি নিয়ে সেখানে বক্তৃতা করেছিলেন।প্রফেসর সাহেব এতে গভীরভাবে প্রভাবিত হন।প্রফেসর সাহেব বড় ধূর্ততার সাথে সেখানে ইসলামী খিলাফতের পক্ষে কিছু কথা বলেন, কিন্তু একই সাথে ইসলামের বিরুদ্ধেও নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। আমাদের এই যুবক খুব সুন্দরভাবে তার উত্তর দিয়েছেন। পরে প্রফেসর সাহেব আমার সাথে দেখা করতে এখানেও আসেন এবং বলেন যে, তোমাদের সেই বক্তা খুবই বুদ্ধিমান। আসলে ইসলামের ওপর হামলাকারী অ-আহমদী পন্ডিত এবং আলেমদের সামনে কিছু কথা বলে এরা তাদের যুক্তি খন্ডন করে বা তাদের কাছে সেই দলীল প্রমাণই নেই, কিন্তু জামাতের কাছে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রদত্ত ধর্মীয় শাস্ত্র এতটা সমৃদ্ধ যে, যদি ভালো প্রস্তুতি থাকে তাহলে যে কারো মুখ বন্ধ করা যায়। কেউ তাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না।

সুতরাং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী পাঠ করা আমাদের জন্য আবশ্যক যেন আমাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি পায় আর একই সাথে এসব রচনাবলীর কারণে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিও হয়। পুরনো বা প্রবীণদের মাঝে তবলীগের একাগ্রতা কেমন মানের ছিল সে কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন যে, আমি কম বয়স্ক ছিলাম, শৈশবের কিছু বন্ধুকে নিয়ে একটি আঞ্জুমান বা এসোসিয়েশন গড়ে তুলি আর তাশহিজুল আযহান পত্রিকা আরম্ভ করি। আমার সে যুগের বন্ধুদের মাঝে একজন হলেন, চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সাঈয়াল সাহেব যিনি পরবর্তীতে যুক্তরাজ্যে মুবাল্লিগ হিসেবেও কাজ করেছেন, তিনি বলেন, চৌধুরী আব্দুল্লাহ্ খান সাহেবের ঘরে তার মেয়ের বিয়ে হয়েছে, চৌধুরী আব্দুল্লাহ্ খান সাহেব চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব-এর ছোট ভাই ছিলেন, একবার চৌধুরী আব্দুল্লাহ খান

সাহেবের স্ত্রী আমাকে বলেন যে, আব্বাজী! অর্থাৎ চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সাঈয়াল সাহেবকে আপনি যখন নাযেরে আলা নিযুক্ত করেছেন, সদর আঞ্জুমানের নাযেরে আলা ছিলেন তিনি, ঘরে তিনি আফসোস করতেন, এবং আক্ষেপ করে বলতেন যে, আমরা তবলীগের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলাম, ইনি আমাদেরকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছেন। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, পক্ষান্তরে আমি এটিও দেখি যে, আমাদের জামাতে এমন মানুষও আছে যারা আমাকে লিখে যে, ওয়াকফে জিন্দেগীর একটা সম্মান থাকা চাই।

তো পুরনো যুগের লোকদের তবলীগের প্রতি যে আগ্রহ এবং একাগ্রতা, এতে শিক্ষনীয় দিক হল তবলীগের জন্য তাদের গভীর আগ্রহ ছিল আর সেই তবলীগের সুযোগকে তারা অফিসে নিযুক্ত হওয়ার ওপর প্রাধান্য দিতেন। আজকাল এখানে কোন কোন সময় এমন হয় অনেকেই বলে যে, আমাদেরকে কেন্দ্রে নিযুক্ত করা হোক, এটি সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। এছাড়া এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, জামাতের যে দৃষ্টিকোণ থেকে মুরব্বী এবং মুবাল্লিগদেরকে দেখা উচিত কোন কোন স্থানে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সম্মান করা হয় না অর্থাৎ জামাতের সদস্য এবং সভ্যরা মুরব্বী এবং মুবাল্লিগদের সেভাবে যত্ন নেয় না বা সম্মান করে না, যেভাবে করা উচিত। আর এ প্রেক্ষাপটে কোন কোন স্থান থেকে এখনও অভিযোগ আসে কিন্তু একই সাথে আমি একথাও বলতে বাধ্য যে, মুরব্বী এবং মুবাল্লিগদের ওপর এই দায়িত্বও বর্তায় আর তাদের ওপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে যে, জামাতে নিজেদের সম্মান এবং মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য তাদেরও জ্ঞানের দিক থেকে এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে উচ্চমর্যাদায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত, যেন জামাতের কোন সভ্য বা সদস্য তাদের সম্পর্কে কোন ভ্রান্ত কথা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে না পারে। কোন কোন স্থানে প্রশাসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু লোক মুরব্বীদের সম্পর্কে অন্যায় কথা বলে বসে। মুরব্বী যেখানে সংশোধনের চেষ্টা করে সেখানে তার বিরুদ্ধে অপলাপ আরম্ভ করে দেয়।

পুনরায় দোয়া গৃহীত হওয়ার রহস্য কী, এর হিকমত এবং প্রজ্ঞার রহস্যের দিকটা তুলে ধরতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এমন নিদর্শন দেখাতে এসেছেন আর এমন মানুষ সৃষ্টি করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, যাদের দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে সুমহান বিপ্লব সাধন করবেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

'চুঁ পেশ আ বারুয়ে কার ইক দুআ বশাদ' (ফারসী পঙক্তি)

এর অর্থ হলো, যা সারা পৃথিবী করতে পারে না তা এক দোয়ার মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, খোদা তা'লা প্রতিটি দোয়া অবশ্যই গ্রহণ করবেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুত্র সাহেবযাদা মোবারক আহমদ সাহেব-এর ইন্তেকাল হয়েছে, হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব ইন্তেকাল করেছেন অথচ তিনি (আ.) তাদের জন্য দোয়াও করেছিলেন কিন্তু তারা ইন্তেকাল করেছেন আর এটিও তাঁর একটা নিদর্শন। কেননা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব সম্পর্কে তিনি পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দিয়েছিলেন আর কোন কথা যখন পূর্বেই জানিয়ে দেয়া হয়, সেটি নিদর্শন গণ্য হয়। সুতরাং সব দোয়া গৃহীতও হয় না আর সব দোয়া প্রত্যাখ্যাতও হয় না। অবশ্য আল্লাহ্ তা'লা যেই দোয়া গৃহীত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তা অবশ্যই গৃহীত হয়, কেউ তা খণ্ডন করতে পারে না।

এরপর দোয়া গৃহীত হওয়ার কথা বলতে গিয়ে এবং পয়গামী বা লাহোরীদের একটি আপত্তি খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি বলেন, লাহোরীরা আপত্তি করে যে, মুসলেহ্ মওউদ-এর সত্তায় মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কি নিদর্শন পূর্ণ হয়েছে? তিনি বলেন, খোদার যেই কৃপাবারী মসীহ্ মওউদ

(আ.)-এর মাধ্যমে বর্ষিত হয়েছে তা চলমান বা অব্যাহত থাকা আবশ্যক। লাহোরীরা এই কথা বলার অবশ্যই অধিকার রাখে যে, তোমার মাধ্যমে সেই কল্যাণরাজি জারী হয় নি বা এই কল্যাণরাজি সূচীত হতে পারে না কিন্তু তাদের জন্য আবশ্যক হবে আমার মোকাবেলায় বা আমার প্রতিদ্বন্দিতায় নিজেদের ইমাম ও নেতাকে নিয়ে আসা আর বলা উচিত যে, এর মাধ্যমে সেই সমস্ত কৃপারাজির বহিঃপ্রকাশ ঘটে আর সত্যিই যদি খোদা তা'লা তার মাধ্যমে ভবিষ্যতের বিষয়াদীর সংবাদ প্রকাশ করেন আর তার দোয়া অস্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেন তাহলে আমরা মেনে নিব যে, যদিও আমরা ভ্রান্তিতে ছিলাম কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সত্যবাদী ছিলেন। এমন আপত্তি করবে না যার মাধ্যমে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা প্রভাবিত হতে পারে। একদিকে বিশ্বাস কর যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা পাঠিয়েছেন, মুজাদ্দেদই হোন না কেন, মুজাদ্দেদ হিসেবেই তোমরা তাঁকে মান যে, তিনি সত্যবাদী ছিলেন, তাঁর দোয়া গৃহীত হতো, তিনি ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন। তো প্রথম কথা হল আমার কথা যদি না-ই বা মানতে হয় না মান, কিন্তু তোমাদের কোন ইমামকে আমার সামনে উপস্থাপন কর, কোন নেতাকে নিয়ে আস এরপর প্রমাণ কর যে, তার দোয়া গৃহীত হয়। যদি এটি প্রমাণ করতে পার যে, তার দোয়া কবুল হয় বা গৃহীত হয় তাহলে আমাদের এটি মানতে কোন অসুবিধা নেই যে, আমরা ভ্রান্তিতে আছি, কিন্তু যদি এটি বল যে, নিদর্শন পূর্ণতা লাভ করছে না বা নিদর্শন সত্য প্রমাণিত হচ্ছে না, তাহলে তোমরা এর মাধ্যমে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতাকে প্রশ্নবানে জর্জরীত করছ।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এদের আসল চিত্র হলো এরা তো দরজাই বন্ধ করে দেয়, কোন কথাই শুনতে চায় না। কোন বিবেক সম্মত কথা বলতেও চায় না। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে আরো কিছু ছোট ছোট দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ ও ঘটণাবলী তিনি (রা.) বর্ণনা করেন। এক কুঁজ মহিলার দৃষ্টান্ত দেয়া হচ্ছে, তিনি বলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক কুঁজ মহিলার ঘটনা শোনাতেন, তাকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে, তুমি কি চাও যে, তোমার কোমর সোজা হয়ে যাক, নাকি এটি চাও যে, অন্যরাও কুঁজ হয়ে যাক? যেহেতু কিছু মানুষ নাছোড় প্রকৃতির হয়ে থাকে, হিংসুকও হয়ে থাকে, সে উত্তর দেয় যে, দীর্ঘ দিন কেটে গেছে, আমি নুজ আর কুঁজ হয়েই চলে আসছি, মানুষ আমার কুঁজ নিয়ে হাসী ঠাট্টা করে, এটি তো এখন আর সোজা হতে পারেই না, এখন তো আমি বয়ঃবৃদ্ধা হয়ে গেছি, এরা সবাই যদি কুঁজ আর নুজ হয়ে যায় তাহলেই আমি আনন্দ পাব আর আমি হেসে তাদেরকে তিরস্কার করে তৃপ্তি পাব। তিনি বলেন, এই ধরণের কিছু হিংসুক প্রকৃতির মানুষ বা হিংসা পরায়ণ প্রকৃতি থেকে থাকে, তাদের এটি নিয়ে কোন মাথা ব্যাথা থাকে না যে, তাদের কষ্ট দূর হোক বরং তারা চায় অন্যরা কষ্টে নিপতিত হোক। সুতরাং এমন হিংসুকদের কবল থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আমাদের দোয়া করা উচিত, আর এই দোয়াও করা উচিত যে, আমরা যেন এমন হিংসুকদের মত না হই যারা এ ধরণের হিংসা প্রসূত কথা বার্তা বলে থাকে।

এরপর এক অন্ধের কাহিনী রয়েছে, এটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, এক অন্ধ ছিল যে রাতের বেলায় অন্য কারো সাথে কথা বলছিল, আলাপচারিতায় মত্ত ছিল, এক ব্যক্তির ঘুম নষ্ট হচ্ছিল তাতে, সেই ব্যক্তি বলল যে, হাফেজ জী! ঘুমিয়ে পড়, হাফেজ সাহেব বললেন যে, আমাদের ঘুমানোর আর অর্থই বা কী, চুপ করাই তো, মুখ বন্ধ করাই তো। এই কথার অর্থ হলো ঘুমানোর অর্থ চোখ বন্ধ করা আর নিরব থাকা, আমার চোখ তো পূর্বেই বন্ধ, এখন নিরবই হয়ে যাব আর কী, নিরবতা পালন করছি। তিনি বলেন, এই যে কষ্টদায়ক অবস্থাগুলো, এগুলো মু'মিনের জন্য কষ্টের কারণ হতে পারে না, কেননা সে বলে

যে, আমি পূর্বেই এতে অভ্যস্ত। যেভাবে মু'মিনকে এই দুনিয়ার মানুষ যখন হত্যা করতে চায় সে বলে যে, আমাকে হত্যা করে কি পাবে, আমি পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লার পথে মৃত্যুকে বরণ করে রেখেছি। আল্লাহ্ যা চান আমি তা করতে প্রস্তুত আছি। আল্লাহ্‌র জন্য আমার প্রাণ প্রস্তুত। তিনি বলেন, পৃথিবীর মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে কিন্তু মু'মিনকে যখন এই পৃথিবীর মানুষ হত্যা করতে চায় সে ভয় পায় না, সে বলে, আমি তো সেই দিনই মারা গেছি যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছি, একমাত্র পার্থক্য হলো পূর্বে আমি চলাফেরারত এক লাশ ছিলাম এখন হয়তো আমাকে মাটির নিচে দাফন করবে, এর ফলে আমার জন্য খুব একটা পার্থক্য সৃষ্টি হবে না। তো এক প্রকৃত মু'মিনের চিন্তা ধারা এমনই হয়ে থাকে।

তিনি আরো একটি দৃষ্টান্ত দেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, এক মহিলা কোন বিয়েতে যোগদান করে, যে ছিল খুবই কৃপণ কিন্তু তার ভাবী ছিল উদার। ননদ এবং ভাবী উভয়ই বিয়েতে যোগদান করে। ভাবী উপহার দেয়ার ক্ষেত্রে বড় মনের ছিলেন, সেই কৃপণ মহিলা বিয়েতে এক রুপিয়া উপহার দেয় কিন্তু তার ভাবী দেয় বিশ রুপি। যখন তারা বিয়ে থেকে ফিরে আসে তখন কেউ সেই কৃপণ মহিলাকে জিজ্ঞেস করে যে, বিয়েতে কি খরচ করেছ? সে বলে যে, আমি এবং আমার ভাবী একুশ রুপি তোহফা দিয়েছি। তো চাঁদার ক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্তকে প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি বলেন, কোন কোন জামাতে কিছু সদস্য আছে যারা মন খুলে চাঁদা দেয়, চাঁদার ক্ষেত্রে বড় মনের পরিচয় দেয়, তাদের চাঁদাকে নিজের প্রতি আরোপ করা তেমনই যেভাবে এই কৃপণ মহিলার এমন কথা বলা যে, আমি এবং ভাবী একুশ রুপি দিয়েছি। কিন্তু কিছু ধনবান বা সম্পদশালী মানুষ এমনও আছে যারা কৃপণ হয়ে থাকে, জামাতের সমষ্টি বা সামগ্রিক চাঁদাকে নিজেদের প্রতি আরোপ করে, এমন দৃষ্টান্তও সামনে আসে। আর নিজেদের প্রতি আরোপ না করলেও অবশ্যই বলে যে, আমাদের জামাত এত টাকা চাঁদা দিয়েছে যেন তাদের জামাতে তিনি সবচেয়ে বেশি চাঁদা দেন, অথচ যারা চাঁদা দিয়েছে তাদের অধিকাংশ দরিদ্র আর ধনীরা সেই অনুপাতে চাঁদা দেয় না।

একবার ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সময় কিছু অন্যায় কথা-বার্তা হয়, ধর্মের সম্মানকে দৃষ্টিতে রাখা হয় নি, জামাতের ঐতিহ্যকে দৃষ্টিতে রাখা হয় নি, এই সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে তিনি তাদেরকে বলেন যে, দেখ হাসি-তিরস্কার বা হাসি-ঠাট্টা বৈধ, নিষেধ নয় বা হাস্যরস নিষেধ নয়। মহানবী (সা.)ও হাস্যরস করতেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও হাস্যরস করতেন। আমরাও করি, আমরা এ কথা বলব না যে, আমরা রসিকতা করি না, আমরা শতবার হাস্যরস এবং রসিকতা করি কিন্তু নিজেদের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী বা নিকটাত্মীয়দের সাথে করে থাকি, এতে কারো তাচ্ছিল্যের দিক থাকে না, যদি কারো তাচ্ছিল্যের দিক থাকে, কারো আত্মসম্মানবোধে আঘাত আসে তাহলে এমন হাসি-তিরস্কার সঠিক নয়। যদি মুখ থেকে এমন শব্দ বের হয় যাতে তাচ্ছিল্যের কোন উপকরণ থাকে তাহলে আমরা ইস্তেগফার করি আর সবারই তা করা উচিত। যদি ভুল বশত এভাবে কারো ঠাট্টা করা হয় যা সে অপছন্দ করে বা তার আত্মসম্মানবোধ পদদলিত হয় তাহলে ইস্তেগফার করা উচিত। সেই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি বলেন, সেখানে একটি কথা হয়। আমি হাসি বা খেলাধুলা সম্পর্কে বলব না যে, এগুলো অবৈধ, তোমরা হাস এবং খেলাধুলা উপভোগ কর, খেলাধুলা ঠিক আছে কিন্তু খেলার ছলে যদি পিতার দাড়ি নিয়ে খেলা আরম্ভ হয় তাহলে এটি বৈধ নয় অর্থাৎ পিতার সম্মানকে যদি পদদলিত করা আরম্ভ কর তাহলে তা বৈধ নয়। খোদার মর্যাদা তাঁকে দাও, ফুটবলের মর্যাদা ফুটবলকে দাও, কবিতার আসরের মর্যাদা কবিতার আসরকে দাও, ভবিষ্যদ্বাণীর প্রাপ্ত মর্যাদা ভবিষ্যদ্বাণীকে দাও। কেউ বা কতক এমন কথা

বলে যাতে হাসি-ঠাট্টা বা তিরস্কারের বরাতে ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলা আরম্ভ করে। যদি খেলাধুলা বা হাসি-ঠাট্টার আগ্রহ থাকে তাহলে লাহোরে যাও, বিভিন্ন কবিতার আসরে যোগদান কর, সেখানে কবিরা পরস্পরের তিরস্কারও করে, এমন কবিতার আসরেই বস, আর পিপাসা নিবারণ কর, কিন্তু অন্য শহরে গিয়ে এমন কর। লাহোরে গিয়ে যদি এমন কর, বিশেষ করে কাদিয়ানের লোকদের সম্বোধন করে তিনি বলেন যে, রাবওয়া, কাদিয়ান যেখানেই কেন্দ্রীয়ভাবে জামাতী অনুষ্ঠানের অধীনে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয় তাদের জন্য এতে শিক্ষনীয় দিক রয়েছে। তিনি বলেন, সেখানে গিয়ে যদি এমন কর তাহলে মানুষ বলবে যে, লাহোরের মানুষ এমন করেছে, কেউ এ কথা বলবে না যে, আহমদীরা এমন করেছে। কিন্তু এখানে এর একদশমাংসও যদি কর তাহলে মানুষ বলবে যে, আহমদীরা এমন করেছে। সুতরাং আমি হাস্যরস থেকে বারণ করি না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে এতটা সীমা ছাড়িয়ে যেও না যার ফলে জামাত দুর্নাম হতে পারে। এখন পৃথিবীর সর্বত্র শুধু কাদিয়ান বা রাবওয়ার কথাই নয় অন্যান্য স্থানেও জামাতী ব্যবস্থাপনার অধীনে খেলাধুলার ব্যবস্থা হয়, সেখানে যদি এমন কোন কথা হয় তাহলে জামাত বদনাম হয়। তাই সর্বত্র এ সম্পর্কে সাবধানতার প্রয়োজন রয়েছে।

অতএব আমাদের প্রতিটি কাজে ও গতিবিধিতে এর বহিঃপ্রকাশ হওয়া উচিত তা খেলাধুলা হোক, বিনোদন বা কবিতার আসরই হোক না কেন। জামাতের সম্মানকে আমরা পদদলিত হতে দেব না, এর সম্মান এবং এর মর্যাদার প্রতি আমরা সব সময় শ্রদ্ধাশীল থাকব। তাই এই যে কয়েকটি কথা আমি বললাম, এগুলো শিক্ষনীয় কথা বা শিক্ষনীয় বিষয়, এগুলোকে দৃষ্টিতে রাখা উচিত।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।